ATMADEEP
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-I, September, 2024, Page No. 01-09
Published by Uttarsuri, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.01W.001

সেলিম মুস্তাফার কবিতায় কবি সত্তার বাঁক বদল ও হাংরি প্রভাব

শান্তনু ভট্টাচার্য, *স্বাধীন গবেষক, স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগ, গভ. ডিগ্রী কলেজ, উত্তর ত্রিপুরা, ভারত*
E mail: imshantanubhattacharjee@gmail.com

Received: 18.08.2024; Accepted: 12.09.2024; Available online: 30.09.2024
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

ABSTRACT

Poetry is the finest form of literature; for that reason, life shines brightly there. This liveliness of life constantly transforms itself. If it's poetry, then it's even more profound. The poet Selim Mustafa from Tripura in the 1970s is similar in this respect, or perhaps distinct. He dives deep into life repeatedly, without merely repeating phrases in his poetry. He alters himself for the sake of the continuity of life in his work. He writes fluidly, sharing his own thoughts, which creates a 'Hungry' effect in the reader's mind. Hungry? Opinions vary on whether it's entirely 'Hungry', but there is indeed some friction present. Otherwise, the speed in his poetry wouldn't manifest in this way. While he doesn't completely deny the themes expressed repeatedly in the 'Hungry' manifesto, he likely acknowledges them. If he didn't, such influences wouldn't be present in his work. Indeed, the soil, Jampui hills, communism, pain of partition and the connection to the common people of Tripura repeatedly draw the poet toward poetry. Like a river flowing in its own way – sometimes calm, sometimes turbulent – Selim Mustafa maintains a similar current in his poetry. This poet, caught between 'Hungry' and extreme leftist politics, constantly transforms himself, bringing a new flavor to his work. He is a remarkable comet in the poetic sky of Tripura, with the essence of constant change and an undeniable focus on 'Hungry'.

Key Wards: *Tripura, Selim Mustafa, Hungry, Poetry, Communism.*

(১)

"তুমি জীবন শেখাবে? কতটুকু জান?
বাহান্ন তাসের পরও আরো এক তাস থেকে যায়—"[১]

জীবনের অদৃশ্য তাস সম্বন্ধে যিনি দৃঢ় কণ্ঠে বলে দিতে পারেন তিনি সত্তরের দশকের ত্রিপুরার উল্লেখযোগ্য কবি সেলিম মুস্তাফা। পীযূষকান্তি দাশ বিশ্বাস তাঁর প্রকৃত নাম। ১৯৫৩ সালে পূর্বপাকিস্তানের (অধুনা বাংলাদেশ) সিলেট ডিস্ট্রিক্টের অন্তর্গত হবিগঞ্জ সাব্‌ডিভিশনের ভাদেশ্বর গ্রামে কবির জন্ম। পেশায় একজন ব্যাংক কর্মী হিসেবে তিনি কাজ করেছেন ত্রিপুরার নানা প্রান্তে। ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকে ১৯৮০ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত চাকুরী করে অফিসার গ্রেড-২ হিসেবে অবসর নিয়েছেন। জগৎ ও জীবনকে তিনি একান্ত নিবিড়ভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন। উত্তর পূর্ব ভারতের উল্লেখযোগ্য সাহিত্য পত্রিকা 'পাখি সব করে রব' পত্রিকা সম্পাদনা তাঁর জীবনের অনন্য সাহিত্যকৃতি। চাকরি জীবন থেকে অবসরে যাওয়ার পর ২০১৩ সাল থেকে এই সাহিত্য পত্র উনি সম্পাদনা শুরু করেন। এখনো পত্রিকাটি প্রতিমাসে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। এখন পর্যন্ত এই পত্রিকার দশ বছর পূর্তি হয়ে গেছে। কবি এই যাবত প্রকাশ করে ফেলেছেন নয়টি কাব্যগ্রন্থ ও একটি গদ্য গ্রন্থ।

সেলিম মুস্তাফার কবিতায় জীবনের নোনাজলে তলিয়ে যাওয়া গভীর ক্ষত সাবলীল ভাষায় চিত্রিত হয়েছে। তিনি তাঁর কবিতায় সময়কে স্পষ্ট রূপে চিত্রায়িত করেছেন। কবিতায় তিনি রাজনীতি ও প্রতিবাদ, প্রকৃতি ও জম্পুই, প্রেম, সর্বোপরি সময়কে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। যে সময় চিৎকার দিয়ে বলে 'ছোরার বদলে একদিন সব ফুল নড়ে উঠবে'। সমালোচক দেবব্রত দেব বলেছেন— "কবিতাকে আক্ষরিকভাবে বুঝে নেবার চেষ্টা করতে গেলেই বিপদ। তাই আমি সেই দিকে না গিয়ে কবিতার লক্ষ্য সন্ধান করতে চেষ্টা করি।"[২] হ্যাঁ সত্যিই তাই। কবিতাকে আক্ষরিকভাবে বুঝতে যাওয়াটা বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁর কবিতার মূল রসের সন্ধান এবং উৎস ও সামাজিক প্রভাবের দিকে লক্ষ্য করলে একটা বিষয় বারবার ধরা দেয় তা হল— কবির নিজেকে পাল্টে ফেলা যা হাংরি প্রভাবেরই প্রতিফলন।

(২)

সত্তরের দশক থেকে শুরু করা কাব্য চর্চায় সেলিম মুস্তাফা নিজেকে পরিবর্তন করতে এবং নিজেকে তলিয়ে দেখতে তৎপর। যা শুরু হয়েছিল 'বাহান্ন তাসের পর' কাব্যগ্রন্থ থেকে এবং যা সাবলীলভাবে এগিয়ে চলেছে 'বারবার পাল্টে যাই' কাব্যগ্রন্থের ধারায় আগামীর দিকে। আসলে কবি শুরু থেকে এখন পর্যন্ত প্রতি সৃষ্টিতে নিজেকে নতুন ভাবে খোঁজার চেষ্টা করেন। নতুন ভাবে খোঁজা? এই নতুনত্ব হচ্ছে নিজেকে ভেঙে ফেলা। কবিতায় নিয়ে আসা নতুন চিন্তা।

কবি সেলিম মুস্তাফা চর্বিত চর্বণ করেন না। তাঁর কবিতায় ফুটে উঠে নিজের পরিবর্তনের কথা। পাল্টে যাওয়ার কথা। কবি লিখেছেন—

"সারাদিন ছুটোছুটি সারাদিন কাজ
সারাদিন ঘাম লালা ভালোবাসা মান অভিমান -
তারও পর সারারাত জেগে বসে থাকা
একা একা

স্বপ্ন আর দুঃস্বপ্নের সমান সমান

অভিযান”[৩]

এই সংকট চিরকালীন সংকটের কথা বলে তাই না? তাহলে সেলিম নিজেকে পাল্টালে কোথায়। সেলিম পাল্টেছেন। কবি বলেন—

“সকলেই সংকটের কথা বলছে
শব্দ হচ্ছে পৃথিবীর তপ্ত বায়ুস্তরে
বায়ুর লাগাম নেই”[৪]

লাগামহীন বাতাসে সংকটের কথা যেভাবেই কবি বলেছেন তা সচরাচর কেউ বলতে পারে না। এই জায়গায় কবি আলাদা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। একটা সংকট মানেই একটা যুদ্ধ। কিন্তু আসলে তা নকল যুদ্ধ। তাই কবি বলেছেন—

“সঞ্জয়, আমাকে বল
কী হচ্ছে ওখানে -
কেন এত কলরব?
বলে দাও -
নকল যুদ্ধের কোনো প্রয়োজন নেই -
আমিই কৌরব আর
আমিই পাণ্ডব।”[৫]

কবিতাটি পড়লেই বোঝা যায় কবি কোন সময়কে ধরার চেষ্টা করছেন। কিন্তু সরাসরি বিষয়টাতে না-গিয়ে মহাভারতের আড়ালে আজকের পরিস্থিতিকেই ধরলেন। কিন্তু কবি পাল্টালেন কোথায়? “আমিই কৌরব আর/আমিই পাণ্ডব।”[৬] এই দেখার মধ্য দিয়ে পাল্টালেন। আজকের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এর চেয়ে সত্য দেখা বা উপলব্ধি কী হতে পারে? এখানে কবি কোথাও কাব্য করেননি। সরাসরি কিছু কথা ছেড়ে দিয়েছেন সাদা কাগজের উপর যেন। এই ধারা অব্যাহত রয়েছে ‘আমার আওয়াজগুলি’ কবিতায়—

“আজ সংঘাত আমার নিত্য সহচর
কিছু বল তো যুদ্ধ,
কিছু না-বলো, তা-ও যুদ্ধ !”[৭]

বর্তমান সময় ধরা দেয় কবির কলমে এইভাবে। যুদ্ধ ছাড়া বর্তমান সময়ে কিছুই সত্য নয়। যুদ্ধ এক চরম বাস্তবতার নাম। এই এই যুদ্ধ সৃষ্টির মূলে রয়েছে ষড়যন্ত্র। আপৎকালীন পরিস্থিতি। তাই কবি লিখেছেন—

“একটা আপৎকালীন সুড়ঙ্গের ভেতর আমি হাঁটছি,
এই হাঁটার দায় একান্তই আমার,
আমি নিজেই ট্র্যাফিক-
নিজেই থানা ও নিজেই পুলিশ-”[৮]

এই সব কিছুর পরও কবি নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন না। বর্তমান সময় পরিস্থিতি কবিকে থাকতে দেয় না। তাই কবি নিশ্চয়তায় ভুগেন—

“অরবিন্দ পালিয়েছিল স্বাধীনতা আন্দোলন ছেড়ে
দাঙ্গা লাগিয়ে গান্ধি কান্নাকাটি শুরু করেছিল অপরাধী হবার ভয়ে
জেলে যাবার ভয়ে উৎপল পালিয়েছিল সাহিত্য - আন্দোলন ছেড়ে

আর সমস্ত অনিশ্চয়তা ফেলে রেখে আমি চলে যাচ্ছি
আরেক অনিশ্চয়তার দিকে"[৯]

এইখানেই বুঝা যায় কবি পাল্টে গেছেন। যা কবিকে স্বতন্ত্র করে তুলে। তাইতো কবি নিজেই বলেন কবিতায় 'বারবার পাল্টে যাই আমি'। সেলিম মুস্তাফা তাই বলতে পারেন—

"আর আমার নামেও পাল্টায় একটা
এফ আই আর লিখে রেখে দিও!
প্রতিশোধ নিতে প্রচন্ড ইচ্ছে হয় আমারও
কিন্তু মনেই থাকে না!
বারবার পাল্টে যাই আমি!"[১০]

পরিবর্তন থাকাটাই স্বাভাবিক। সেলিমের লেখায় এই পরিবর্তন ধরা দেয় তার বন-জঙ্গলের ধারণাতেও। কারণ যে জঙ্গল জম্পুই এর কথা বলেছে সেই জঙ্গলের মাধ্যমে বর্তমান পরিস্থিতির কথা কবি খুবই স্পষ্টভাবে বলছেন। 'জঙ্গলে' কবিতায় সেলিম লিখছেন—

"জঙ্গলে ঢুকে পড়েছি,
পা টিপে টিপে
খুবই সতর্ক চলাফেরা,
শব্দ
হলেই বিপদ
এখন শব্দই
শত্রু"[১১]

অর্থাৎ পাল্টানো চলছে। কবি নিজের ধারায় অবিচল। যে জঙ্গল কবির কাছে প্রিয় তার ধারণাও সময়ের সাথে পাল্টাচ্ছে। এটাই স্বাভাবিক। সময়ের সাথে নিজেকে আপডেট করতে হয়। যা চিরকালীন অনন্ত। যে অনন্ত সম্বন্ধেও কবি বলতে গিয়ে নিয়ে আসেন নতুন ধারণা। কবি লিখছেন—

"অনন্ত কে, সে কোথায় থাকে
কোথায় যায় কেউ জানে না,
তাকে আমিও চিনি না"[১২]

কবি বর্তমান ট্রেন্ড সম্পর্কে অবগত। তাই কবি ছবির কথা বলেন। বলেন যুবকের কথা যুবতীর কথা অথবা তথাকথিত মানুষের কথা। তাদের ক্রিয়া-কলাপ, ভিড়ের মাঝে ঢুকে পড়ার কথা, সম্পর্কের কথা। কবি বলেন—

"কেউ কারো ছবি তুলছে,
আমিও দু-আঙুলে ভি দেখালাম
ভি মানে ভিড়- ভিড়ের ছবিতে কিছু দেখাতে হয়
ছবি ছাড়া কোথাও কি মানুষেরা আছে!"[১৩]

আসলেই বর্তমান সময়ে আমরা যাই করি তাই ছবি তুলি। ছবি যেন দলিল ও প্রমাণ। যেখানে ঢুকে পড়া খুবই দরকার। ভি-ভিড়ের মত। যেখানেই না থাকলে তোমার অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। তাই কবিও ঢুকে পড়েন ভিড়ে। আসলেই সবই সময়। সেই সময় সম্বন্ধে কবি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। সময়ের অন্তর্ঘাতে সভ্যতা ও সংস্কৃতি একই সরলরেখা বরাবর যায় না। সেটা একযোগে বিভিন্ন দিকে প্রসারিত হতে থাকে।

এটাই স্বাভাবিক। আর এখানেই চলে আসে জৈবপ্রক্রিয়ার ধারণা এবং সেজনয্ই সমাজের বিভিন্ন অংশের কোনদিকে বাঁকবদল ঘটবে, তা আগেই বলা যায় না। এমত অবস্থায় যখন শুধুমাত্র নিজের সৃজনক্ষমতার ওপর নির্ভর করা হয়, তখনই সংস্কৃতি বিকশিত ও সমৃদ্ধ হয়। তাবে সৃজনক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে গেলে, তা বাইরে থেকে যা পায়, তাই আত্মসাৎ করতে থাকে, খেতে থাকে, তখন তার ক্ষুধা তৃপ্তিহীন। ফলত তখনই লেখায় চলে আসে রাজনৈতিক, সামাজিক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উদ্বাস্তু কলোনীতে মানুষের ভিড় আর সর্বোপরি স্বরাজের স্বপ্নকে গুঁড়িয়ে দিয়ে স্বার্থ আর নোংরা রাজনীতির নগ্ন খেলা। এসবকিছুর প্রেক্ষাপটে সরকার, কর্তৃপক্ষ আর প্রতিষ্ঠানের প্রতি স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বাসের নড়ে যাওয়া ভিতটাকে ষাটের যে যুবসমাজ গা রী রী করা ভঙ্গিমায় তুলে ধরল, তাদের ছোঁয়া অতি অবশ্যই পেয়েছিলেন কবি সেলিম। কারণ পশ্চিমবঙ্গের যে কজন মিলে হাংরি তত্ত্বকে বুকে পিঠে করে প্রথম পর্বে যাত্রা শুরু করেছিলেন, তাঁদের দ্বারাই একসময় দেখা যায় যে তৎকালীন পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা যুবসমাজের প্রতিনিধিদের উপর হাংরি আন্দোলনের ব্যাপক প্রভাব বিস্তার হয়। ফলত তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণও ঘটে। যথারীতি তাঁরাও শরণাপন্ন হন এমন একটি প্রতিষ্ঠান বিরোধী, শাসকবিরোধী কাব্য আন্দোলনে। যার ফলে আমরা পরবর্তীতে দেখতে পারি সেলিম অনর্গল বলতে পারেন নির্দ্বিধায়—

"মানুষ, বল কী কী পেলে
বল, এখনো যোনির কাছে কেন এত উষ্ণ সন্নিপাত, বল, এখনো স্তনের
কাছে কেন এত নষ্ট প্রণিপাত?
তা'কে কি হাতের মুঠোয় এম্নি করে ধরা যায়-
যাকে পেতে এই হাঁটা-ছায়া ও রোদের ভেতর জীবনের গূঢ় অন্বেষণ।
বল! মুখ খুলে কথা বল, চোখ খুলে জীবনের গাঢ়তা বোঝাও!
মানুষ, আমাকে চক্ষু দেখাও!"[১৪]

সত্তরের দশকের সময়ে কবি প্রদীপ চৌধুরীর সাথে সেলিমের সখ্যতা খুবই আন্তরিক হয়ে ওঠে। চাকরির সুবাদে প্রদীপ চৌধুরী দুবছর ঐ সময় ধর্মনগর ছিলেন, এর আগে আগরতলা ছিলেন, এইসব বিভিন্ন কারণে সেলিম প্রদীপ চৌধুরীর ব্যক্তিজীবন, মানসচিন্তন, দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি খুব কাছে থেকে লক্ষ্য করেন; ফলত তিনি কবি প্রদীপ চৌধুরীর ঘরানার প্রতি অবচেতনে আকৃষ্ট হন। সেলিমের লেখার গঠন, প্রকাশভঙ্গি, নব্য আলঙ্কারিক রীতির চাষ, শব্দের ঝনঝনানি প্রয়োগ, হাইডেগারীয় দর্শনের প্রলেপ সোজাসুজি দাঁড় করায় কোনো বাঁকা কথার বিপরীত পার্শে। যেখানে তিনি সোজাকে সোজা আর বাঁকাকেও সোজা করে বলেছেন।

"যৌনতা আর কান্নার জল
আমাকে ডিজাইন করে অভাবের মতন -
যেদিকে তাকাই শুধু দাঁত"[১৫]

(৩)

হাংরি আন্দোলনের সাহিত্যিকরা তাঁদের আন্দোলনকে কাউন্টার কালচারাল মুভমেন্ট এবং তাঁদের সাহিত্যকর্মকে কাউন্টার ডিসকোর্স হিসেবে প্রচার করেন। ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হাংরির দ্বিতীয় কবিতার ম্যানিফেস্টোতে 'শিল্পের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কবিতা সৃষ্টির প্রথম শর্ত' বলে প্রচার করা হয়। কবিতা রচনার তাগিদকে তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন ব্যতিক্রমী দৃষ্টিতে। যেখানে নির্দ্বিধায় ঘোষিত হয় 'এখন কবিতা রচিত হয় অরগ্যাজমের মতো স্বতঃস্ফূর্তিতে'। এটা ছিল হাংরিদের প্রথম ইস্তাহার। এটাকে কেন্দ্র করে যদি এগিয়ে যাই, তাহলে সেলিমের কবিতাকে আমরা পুরোপুরি হাংরি জোনারের লেখা বলতে পারি না। কেন

পারি না? কারণ হাংরিরা যে বলতো 'কবিতা সতীর মতো চরিত্রহীনা, প্রিয়তমার মতো যোনিহীনা ও ঈশ্বরীর মতো অনুন্মেষিণী।' সেটা সেলিমের লেখায় এতটা উচ্চাঙ্গ মার্গে প্রকাশ পায়নি। যেমনটা মলয় রায়চৌধুরী, ফাল্গুনী রায় ও শৈলেশ্বর ঘোষেরা করেছিলেন। তবে একেবারে যে ঐ স্বাদ তাঁর লেখায় নেই সেটা বলা যায় না। অহরহ রয়েছে। তবে ঘোর হাংরি যে সেলিম, তাও নয়। অবশ্য কবি সেলিম নিজেই বলেন, তিনি হাংরি নন, তিনি হাংরি অনুরাগী, এতটুকুই। শৈলেশ্বরকে পড়তে তিনি ভালোবাসেন।

এই যে শিল্পের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানো যেমনটা মলয় বলেছিলেন, কবি সেলিম মুস্তাফা ঠিক সেটাকে নিজের মতো করে শৈলেশ্বরের দৌলতে গ্রহণ করেছিলেন। শৈলেশ্বর ১৯৬৮ সালে যে তাঁর 'মুক্ত কবিতার ইস্তেহার' বের করেন, সেখানে তিনি ২৮ টি প্রতিজ্ঞার কথা বলেন। মলয় আর শৈলেশ্বরের বক্তব্যে গুণগত সাদৃশ্য থাকলেও মাত্রাগত কিছুটা ফারাক রয়েছে। মলয় শুধু নৈরাজ্যের দিকে হেঁটেছেন, কিন্তু শৈলেশ্বর বলেছেন অপরাধ চেতনার প্রতিফলন এখন দরকার। মানুষের অভিজ্ঞতার অন্তিম পর্যায়ে পৌঁছোতে হবে। প্রতিধ্বনিকে ঘৃণার মাধ্যমে জীবনের ভয়ানক সম্পর্কগুলোকে তুলে ধরতে হবে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রুচির গঠন ভাঙতে হবে। প্রকাশভঙ্গির নব্য নির্মাণ তাঁর মধ্যে সবচেয়ে বেশি কাজ করেছিল। ভয়ঙ্কর ও অপরাধপ্রবণ চিত্তের প্রবণতার সঙ্গে প্যাশন দিয়ে কবিতাকে তীব্র আঘাত করতে চেয়েছেন শৈলেশ্বর। যার রেশ এসে প্রবেশ করে কবি সেলিম মুস্তাফার বুকে, মুখে, চোখে ও কলমে। এজনয্ই সেলিম '১৮টি দীর্ঘ কবিতা' কাব্যের 'মায়াদর্শন' কবিতায় বলছেন—

"কোথাও জ্বলছে একটা স্টোভ - সূর্য উল্টে আছে একেবারে,
কেউ বলল- 'রৌদ্রের নিচেই কারাগার, কারাগারের ভেতর
কবিগান হচ্ছে', আমি দেখলাম জ্বলছে
একটা স্টোভ- শোঁ শোঁ শব্দ হচ্ছে তার,
দু'জন কবিয়াল হাঁটু অব্দি ধুতি তুলে-
তাদের রোমশ শরীরে কুস্তির ভঙ্গি,
সামনের গদগদ নারীবৃন্দের দিকে আঙুল তুলছে আর গাইছে- 'জ্বালিয়ে
আগুন পালিয়ে গেলি নিভিয়ে
গেলি না, জ্বালিয়ে আগুন পালিয়ে গেলি নিভিয়ে গেলি না.....' হঠাৎ
আসরে নামলো একটা বাঁদর এবং
মেয়েদের ভেতর 'ও মাগো' বলে চেঁচিয়ে উঠল কেউ,
কেউ একজন বলল- 'এই ফুলু দেখ দেখ.....
দুটো বাচ্চা কেঁদে উঠল আর আসরের
মাথায় দাঁড়ানো, হাফপ্যান্ট পরা আরেকটা বাচ্চার
হাঁটু বেয়ে নেমে এল দু'ঘণ্টার আটকে রাখা পেচ্ছাব...."[১৬]

এই গঠনই সেলিমকে হাংরি করে তুলে। এই ভাবনাই সেলিমকে হাংরি প্রমাণিত করে। আরেকটি জায়গায় সেলিম বলছেন—

"একটি চুম্বনের পর আরেকটি জোরদার চুম্বন আমি আশা করেছিলাম, একটি ছোবলের পর আরেকটি বিষাক্ত ছোবল ঠিক ব্রহ্মতালুতে, একটি গুলির পর আরেকটি গুলি, তারপর আরেকটি, তারপর আরো অনেকগুলি! কিন্তু ওরা তা করেনি, ওরা নিঃসাড়ে
ফিরে গিয়েছিল, অন্ধকারে বোঝা যায়নি সবুজ
ঘাসের ওপর কত ফোঁটা রক্ত
ঝরে পড়েছিল? নাকি কিছুই পড়েনি, শুধু শূন্যতা?"[১৭]

ভাষার মুন্সীয়ানায় ছলছল পাতলা শব্দের ভেতর হাংরিয়ান এফোরিমিজম ও আর্কেটাইপ ধরে ধরে সেলিম যে দর্শন চিনিয়ে দিয়েছেন আমাদের তা-ই তাঁর হাংরি বলয়। ১৯৬১ এর নভেম্বর মাসে প্রকাশিত হাংরিদের প্রথম ইস্তাহারে মলয় যেরকম বলেছিলেন—"Poetry is no more a civilizing manoeuvre, a replanting of bamboozled gardens." ঠিক সেই কথাকেই ১৯৭৮ এর দিকে সেলিম লিখেন তাঁর জীবন দর্শন দিয়ে—

"..... বৃক্ষরা সত্য নিয়ে বাঁচে,
আমি আজ নিজের ভেতর সেই সত্য চাই, যা
গলিত বেশ্যা-যোনির নির্বিকল্প আত্মা হতে পারে-
এর চেয়ে গাঢ় সত্য
এর চেয়ে দৃঢ় সত্য পৃথিবীর কোনোখানে নেই!"[১৮]

অতঃপর বলা যায় যে এই পরিবর্তন চিরকালীন। যা কবি এবং কবির লেখাকে বারবার দুমড়ে মুচড়ে দেয়। তাই প্রতিটা লেখা নতুন কথা বলে। নতুন সময়ের কথা বলে। নতুন ঘটনার কথা বলে। মানুষের কথা এবং সেই মানুষকে নিয়ে নতুন রাজনীতির কথা বলে। যার পেছনে অথবা সামনে, প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে হাংরি প্রভাব অবশ্যই রয়েছে। যা মানুষের অন্তরে জাগিয়ে তুলে নতুন সময়ের তাগিদের কথা। যা কবির লেখায় এনে দেয় নতুনত্ব। এই নতুন মানেই পরিবর্তন। আর পরিবর্তন মানে পাল্টানো। আর সেই পাল্টানো মানেই নিজেকে ভেঙ্গে ফেলা। নিজের লেখাকে ভাঙ্গা। কবিতার ফর্ম, স্টাইল, ইত্যাদিতে নতুনত্ব নিয়ে আসা। যে নতুনত্বের মধ্যে লুকিয়ে আছে তত্ত্ব। যা এক ধারায় চলে না। বারবার নতুন চিন্তা নিয়ে আসে। যা থেকে একটা আশা দেখা দেয় নতুন তত্ত্বের সৃষ্টির। যা হুবহু হাংরি প্রভাব না হলেও হাংরি ঘেষা তো বটেই। এই সমস্ত কিছুই সেলিম মুস্তাফার কবিতাকে আলাদা করে তুলেছে। তাই তাঁর কবিতা পাঠকের মণিকোঠায় সুদীর্ঘকাল ধরে ধারাবাহিকভাবে বহন করে চলেছে বাস্তবসম্মত কাব্যিক সৌরভ।

তথ্য সূত্র :

১) মুস্তাফা সেলিম, বাহান্ন তাসের পর, সোনিক অর্কেস্ট্রা, ধর্মনগর, প্রথম প্রকাশ- ১৯৭৮, পৃ: ৩
২) দে তমালশেখর, সেলিম মুস্তাফার কবিতা-জগৎ, সাক্ষাৎকার এবং, নীহারিকা পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ- ২০২২, পৃ: কথামুখ ৬
৩) মুস্তাফা সেলিম, সংকট-১, বারবার পাল্টে যাই, সৈকত প্রকাশনী, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ- মার্চ ২০২৩, পৃ: ৭
৪) ঐ, পৃ: ৭
৫) মুস্তাফা সেলিম, নকল যুদ্ধ, বারবার পাল্টে যাই, সৈকত প্রকাশনী, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ- মার্চ ২০২৩, পৃ: ১০
৬) ঐ, পৃ: ১০
৭) দাশ বিশ্বাস পীযূষকান্তি (সম্পাদনা), আমার আওয়াজগুলি, পাখি সব করে রব, দশম বর্ষ, ১২০ সংখ্যা, অক্টোবর ২০২৩, পৃ: ৫৯
৮) আপৎকালীন সুড়ঙ্গের ভেতর আমি হাঁটছি, জঠর প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, জুলাই ২০২৩, পৃ: ৪৭

৯) চক্রবর্তী শম্ভু সংকর (সম্পাদনা), অনিশ্চয়তা, জঠর প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, সুবল চক্রবর্তী (সম্পাদনা), জুলাই ২০২৩, পৃ: ৫০

১০) চক্রবর্তী সুবল (সম্পাদনা), বারবার পাল্টে যায় আমি, জঠর প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জুলাই ২০২৩, পৃ: ৫১

১১) নাথ ঋশিকেশ (সম্পাদনা), জঙ্গলে, শব্দনীল, ২৬ তম সংখ্যা, পৃ: ২০

১২) দাশ বিশ্বাস পীযূষকান্তি (সম্পাদনা), অনন্তকে পাওয়া যাচ্ছে না, পাখি সব করে রব, ১১৪ সংখ্যা, এপ্রিল ২০২৩, পৃ: ৪

১৩) দাশ বিশ্বাস পীযূষকান্তি (সম্পাদনা), ছবি, পাখি সব করে রব, ১২৫ সংখ্যা, মার্চ ২০২৪, পৃ: ৮

১৪) মুস্তাফা সেলিম, বাহান্ন তাসের পর, সোনিক অর্কেস্ট্রা, ধর্মনগর, প্রথম প্রকাশ- ১৯৭৮, পৃ: ১০

১৫) মুস্তাফা সেলিম, বারবার পাল্টে যাই, সৈকত প্রকাশনী, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ- মার্চ ২০২৩, পৃ: ১৫

১৬) মুস্তাফা সেলিম, মায়াদর্শন, ১৮টি দীর্ঘ কবিতা, সৈকত প্রকাশনী, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ- সেপ্টেম্বর ২০১৭, পৃ: ১৫

১৭) মুস্তাফা সেলিম, এই পাহাড় ঘুম দাঙ্গা প্রেম ও প্রণিপাত, ১৮টি দীর্ঘ কবিতা, সৈকত প্রকাশনী, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ- সেপ্টেম্বর ২০১৭, পৃ: ৩১

১৮) মুস্তাফা সেলিম, বাহান্ন তাসের পর, সোনিক অর্কেস্ট্রা, ধর্মনগর, প্রথম প্রকাশ- ১৯৭৮, পৃ: ১৬

গ্রন্থপঞ্জি:

আকর গ্রন্থ:

১) মুস্তাফা সেলিম, বাহান্ন তাসের পর, সোনিক অর্কেস্ট্রা, ধর্মনগর, প্রথম প্রকাশ- ১৯৭৮।

২) মুস্তাফা সেলিম, ছোরার বদলে একদিন, ক্ষুধার্ত-স্বকাল, কলকাতা-৯২, প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪।

৩) মুস্তাফা সেলিম, ইতি জঙ্গল কাহিনি, অক্ষর পাবলিকেশনস, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ- আগরতলা বইমেলা ২০০৯।

৪) মুস্তাফা সেলিম, দেবতার অনুরোধে, সৈকত প্রকাশনী, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারী ২০০৩।

৫) মুস্তাফা সেলিম, শ্রেষ্ঠ কবিতা, অক্ষর পাবলিকেশনস, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ- আগরতলা বইমেলা ২০১১।

৬) মুস্তাফা সেলিম, ভাষাশহিদ স্টেশনের দিকে একটি আহত ট্রেন, অক্ষর পাবলিকেশনস, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারী ২০১৪।

৭) মুস্তাফা সেলিম, ১৮টি দীর্ঘ কবিতা, সৈকত প্রকাশনী, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ- সেপ্টেম্বর ২০১৭।

৮) মুস্তাফা সেলিম, একদিন যে-কোনোদিন, সৈকত প্রকাশনী, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ- আগরতলা পুস্তকমেলা, ডিসেম্বর ২০১৯ ।

৯) মুস্তাফা সেলিম, বারবার পাল্টে যাই, সৈকত প্রকাশনী, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ- মার্চ ২০২৩।

সহায়ক গ্রন্থ:

১) দে তমালশেখর, সেলিম মুস্তাফার কবিতা-জগৎ, সাক্ষাৎকার, নীহারিকা পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ- ২০২২।

২) চক্রবর্তী অভিজিৎ, ত্রিপুরায় বাংলা কবিতা, নীহারিকা পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ- আগরতলা বইমেলা ২০১৭।

৩) শক্তিপদ, জাফর, সেলিম ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, তমাল শেখর দে, স্রোত প্রকাশনা কুমারঘাট, প্রথম সংস্করণ- জানুয়ারি ২০০৯।
৪) একটি অদৃশ্য তাস এবং সেলিম, মুনমুন দেব, নীহারিকা পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারি ২০২২।
৫) পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা, নবেন্দু সেন (সম্পাদনা), ড্যান্স পাবলিশিং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- মে ২০০৯।
৬) সাহিত্য প্রকরণ, হীরেন চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, সংযোজিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ - ১ বৈশাখ ১৪২৯ ।
৭) মুখোমুখি মলয় রায় চৌধুরী, সাক্ষাৎকার- গোবিন্দ ধর, স্রোত প্রকাশনা কুমারঘাট, প্রথম সংস্করণ- ফেব্রুয়ারি ২০২২।

সাহিত্যপত্র:

১) পাখি সব করে রব, দশম বর্ষ, ১২০ সংখ্যা, অক্টোবর ২০২৩, পীযুষকান্তি দাস বিশ্বাস (সম্পাদনা), ধর্মনগর উত্তর ত্রিপুরা।
২) পাখি সব করে রব, ১১৪ সংখ্যা, এপ্রিল ২০২৩, পীযুষকান্তি দাস বিশ্বাস (সম্পাদনা), ধর্মনগর উত্তর ত্রিপুরা।
৩) পাখি সব করে রব, ১২৫ সংখ্যা, মার্চ ২০২৪, পীযুষকান্তি দাস বিশ্বাস (সম্পাদনা), ধর্মনগর উত্তর ত্রিপুরা।
৪) শব্দনীল, ২৫ তম সংখ্যা, একুশে মার্চ ২০২৩, পয়েন্টস ইউনিট, ঋষিকেশ নাথ (সম্পাদনা), ধর্মনগর উত্তর ত্রিপুরা।
৫) শব্দনীল, ২৬ তম সংখ্যা, একুশে মার্চ ২০২৪, পয়েন্টস ইউনিট, ঋষিকেশ নাথ (সম্পাদনা), ধর্মনগর উত্তর ত্রিপুরা।
৬) জঠর, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০২৩, (কথা ও কবিতায় সাপ্তাহিক সাহিত্য আসরের সাহিত্য পত্র), সুবল চক্রবর্তী (সম্পাদনা), ধর্মনগর উত্তর ত্রিপুরা।
৭) জঠর, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, জুলাই ২০২৩, (কথা ও কবিতায় সাপ্তাহিক সাহিত্য আসরের সাহিত্য পত্র) , শম্ভু শংকর চক্রবর্তী (সম্পাদনা), ধর্মনগর উত্তর ত্রিপুরা।
৮) জঠর, দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, জানুয়ারি ২০২৪, (কথা ও কবিতায় সাপ্তাহিক সাহিত্য আসরের সাহিত্য পত্র), মধুমিতা ভট্টাচার্য (সম্পাদনা), ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা।

অভিধান :

১) বাংলা একাডেমি বানান অভিধান, পশ্চিমবঙ্গ সাহিত্য একাডেমি, পুনঃমুদ্রণ ২০০৯।